গুরুপ্রণতি

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

স্বামী নিরন্তরানন্দ

নামেও গম্ভীর, কাজকর্ম, ব্যবহার, কথাবার্তাতেও গম্ভীর ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী। কমকথার মানুষ। এত বই লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, দিনে-রাতে কর্মব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু কখনও তাঁর অল্পকথার রীতি থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি যেমন রীতিপরায়ণ, তেমনই নীতিপরায়ণ ছিলেন। স্বামী নির্বাণানন্দজী একবার মন্তব্য করেছিলেন, ''Gambhirananda is a man of principles.''

একটি ঘটনা। গম্ভীরানন্দজী তখন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, আর প্রিয়ব্রতানন্দজী নবাগত ব্রহ্মচারী। দুজনের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। গম্ভীর মহারাজকে ব্রহ্মচারী সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, ''মহারাজ, আপনাকে কাজের সময় মিথ্যে কথা বলতে হয়?'' প্রশ্নের কারণ, ব্রহ্মচারী মহারাজের ধারণা ছিল ছোট-বড় সংস্থার মাথাদের পক্ষে সবসময় সবার কাছে সত্য বলা চলে না, অথচ 'কথামৃতে' পড়েছিলেন ''সত্য কথা কলির তপস্যা।'' তিনি তাই সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক মহারাজকে এই প্রশ্ন করেছেন। মহারাজ সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ না করে উত্তর দিলেন, ''না।''

রীতি-নীতি, সত্যে নিষ্ঠা, নিয়মের অনুবর্তিতা, তদুপরি অল্পকথায়, সন্তুষ্টির ঘেরাটোপে সীমিত ছিল গম্ভীরানন্দজীর জীবন। তার জন্যই তিনি অপর সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে সর্বদা পারেননি, ক্ষেত্রবিশেষে নিজেকে উঁচু পদ বা অবস্থা থেকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

অনেকের মুখে শুনি, গম্ভীরানন্দজীর জীবনে গীতোক্ত 'অরতির্জনসংসদি' লক্ষিত হয়েছিল। একাকিত্ব ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ, একা থাকতে চাইতেন।

গম্ভীরানন্দজীর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব চারটি থামের উপর স্থাপিত ছিল—চার প্রকারের নিষ্ঠা—সাধননিষ্ঠা, স্বাধ্যায়নিষ্ঠা, সেবানিষ্ঠা ও সময়নিষ্ঠা।

সাধকের সাধন-ইতিহাস একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। তার সম্যক্ পরিচয় সাধকের পক্ষেই জানা সম্ভব, অপরের পক্ষে অনুমান-সাপেক্ষ। গম্ভীরানন্দজীর বাহ্য আচরণ থেকে বুঝেছি, তিনি সাধনায় ডুবে থাকতেন সর্বদা। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি মালা নিয়ে জপধ্যান করতেন। এর কখনও ব্যত্যয় হত না। শারীরিক কারণে একান্ত অপারগ হলে তবেই এর অন্যথা দেখা যেত। রুদ্রাক্ষের মালাটি তিনি তাঁর গুরু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। বস্তুত

স্বামী কাশীশ্বরানন্দজীই কাশী থেকে এই মালাটি তাঁর জন্য পাঠিয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। গুরুর দেওয়া মালার যথাযোগ্য ব্যবহার তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত করে গেছেন।

প্রবীণদের মুখে শুনি, যিনি সাধনা করেন তিনি সাধক, তিনিই সাধু। এই কথার জ্বলন্ত উদাহরণ গম্ভীরানন্দজী। আনুষ্ঠানিক প্রথা মেনে তাঁকে কখনও কাউকে উপদেশ দিতে দেখিনি। ব্রহ্মচর্য দীক্ষালাভের পর সদ্যোদীক্ষিত ব্রহ্মচারীরা তাঁর কাছে আসে, ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের জন্য উপদেশ প্রার্থনা করে। একবার, মহারাজ তখন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ, তাদের বললেন, ''তোমাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দিতে পারি।'' তখন কয়েকজন বেশ সুন্দর প্রশ্ন করে, মহারাজও খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। সবশেষে এক ব্রহ্মচারী বলে বসে, ''মহারাজ, এখন আপনি আমাদের কিছু উপদেশ করুন। আমরা বিভিন্ন কাজকর্মের পরিস্থিতিতে কেমনভাবে চলব ইত্যাদি বিষয়ে আপনার নির্দেশ বলুন।'' মহারাজের উত্তর ছিল, ''তোমরা ঠাকুর, মা, স্বামীজীর এতসব বই পড়লে, এত শাস্ত্র পড়লে, ট্রেনিং সেন্টারে দু-বছর ধরে এত সব শুনলে, এখনও আমার উপদেশ দরকার? যা পড়েছ, শুনেছ—সেগুলো মনে রাখলেই হবে।''

একবার হাসপাতাল থেকে ফিরে মহারাজ বিশ্রামের জন্য আরোগ্যভবনে অবস্থান করছিলেন। সেইসময় একদিন নৈশ আহারের আগে চেয়ারে বসে রজনীকান্ত সেন রচিত ''পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস...'' গানটি বিভোর হয়ে গাইছিলেন। শুনে সেবক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, কারণ এই পরিণত বয়সেও তিনি সম্পূর্ণ গানটি সুর সহ মনে রেখেছেন! সাধনজীবনের মূলসুর যে-নিরন্তর ভগবৎস্মরণ-মনন, তা যেন তিনি গানটির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন।

পূজনীয় গম্ভীরানন্দজীর সঙ্গে ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ প্রথমবার আমার হয়েছিল, যখন তিনি রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমের অধ্যক্ষের আহ্বানে হাওড়া থেকে রাঁচি যাচ্ছিলেন। আমার তখন সাধুজীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না, সবেমাত্র বেলুড় মঠে যোগদান করেছি। পরদিন ভোরবেলায় ট্রেন 'মুড়ী' জংশনে দাঁড়াল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন সময় কত। যখন শুনলেন ভোর চারটে, তিনি বিছানাতেই সোজা হয়ে বসে আমার কাছে গঙ্গাজল, জপের মালা চাইলেন। জপমালা হাতে পেয়েই তিনি জপে বিভোর হয়ে গেলেন।

এইটুকুতেই এ-ঘটনা শেষ হয়ে গেল না। মহারাজ আমাকে নির্দেশ দিলেন জপের জন্য তাঁরই বিছানায় বসতে। আমি ইতস্তত করায় তিনি বললেন, ''আরে, এই করেই সময় শেষ হয়ে যাবে।'' আমি বাধ্য হয়ে তাঁরই পাশে বসে পড়লাম। এ-ঘটনা থেকে বোঝা যায় মহারাজের সাধননিষ্ঠা কত গভীর ছিল।

গম্ভীরানন্দজী সাধারণ ভক্তসমাজে সুপরিচিত ছিলেন না। যেটুকু পরিচিতি ছিল তা তাঁর রচিত প্রামাণ্য অথচ সুখপাঠ্য গ্রন্থগুলির মাধ্যমেই। তাঁর সারস্বত সাধনার ইতিহাস সাধু ও বিদ্বজ্জনের কাছে পরিজ্ঞাত ছিল। তাঁর স্বাধ্যায়ে যেমন বিস্তৃতি তেমনই গভীরতা। যখন তিনি সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদে বৃত হলেন ও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী কলকাতার পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত হল, তখন তাঁকে দর্শন করতে কলকাতা শহর থেকে বহু মানুষ বেলুড় মঠে যেতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা মহারাজের রচিত 'শ্রীমা সারদা দেবী' বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের অন্তরের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই মহারাজের কাছে যেতেন। মহারাজ তাঁর সাধুজীবনের প্রথম কিছু বছরের মধ্যেই লিখেছিলেন সংস্কৃত স্তবস্তুতির সংকলনগ্রন্থ 'স্তবকুসুমাঞ্জলি'। তাতে তিনি সংস্কৃত

শ্লোকের অন্বয় ও শব্দার্থ দিয়েছেন। গ্রন্থটি পড়ে এবং তার বঙ্গানুবাদ-শৈলী দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন এবং উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করেন। ওইসময়েরই সামান্য পরে প্রকাশিত হয়েছিল গম্ভীরানন্দজীর 'উপনিষদ গ্রন্থাবলির' প্রথম খণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজী গ্রন্থটি পড়ে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং লেখককে অভিনন্দন জানাতে চেয়ে তাঁর কাছে যেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

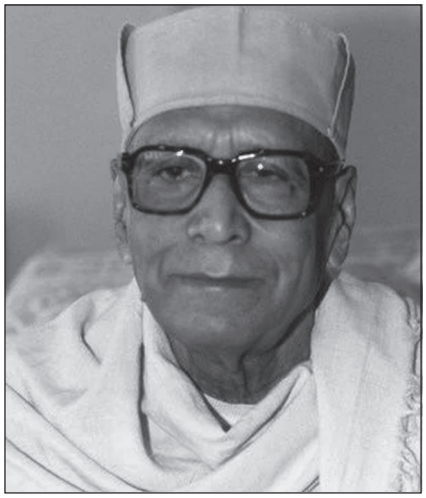

মহারাজের বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতা তাঁর লেখাপড়ার কাজে, সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারত না। যখন তাঁর বয়স আশির উপর, সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ পদে সমাসীন, দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা, তখনও সেবকদের সাহায্য নিয়ে দুরূহ সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের কাজ করেছেন। এর জন্য প্রতিদিন তাঁকে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় দিতে হত। তার উপর আবার একঘণ্টা সেবকদের জন্য তিনি শাস্ত্রের ক্লাস নিতেন। তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসেবে আমরা পাই গীতার শাংকরভাষ্য সহ অনুবাদ, মধুসূদন সরস্বতীর গূঢ়ার্থদীপিকার অনুবাদ, শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ।

সারস্বত সাধনা মহারাজের কাছে ছিল আধ্যাত্মিক সাধনারই প্রকারভেদ মাত্র। গ্রন্থরচনা, বক্তৃতাদি তাঁর নিত্যকর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্তুতি-প্রশংসা তিনি কম লাভ করেননি, কিন্তু তাঁর মনে কোনও অভিমান বা অহংকার ছাপ ফেলতে পারেনি। ঠাকুরকেই তিনি সর্বকর্মের কর্তা ভাবতেন। এক ভক্ত মহারাজের দৃষ্টিশক্তিহীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে মহারাজ বলেছিলেন, ''তাঁর যতটুকু কাজ করাবার ছিল তিনি তা করিয়ে নিয়েছেন, তারপর তাঁর জিনিস তিনি নিয়ে নিয়েছেন।'' নিজের সারস্বত সাধনার সাফল্য সম্বন্ধে কোনও কথা তাঁর মুখে শুনিনি।

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মুখে শুনেছি, তিনি কখনও ছুটি নিয়ে হিমালয়ের নির্জন স্থানে তপস্যা করতে যাননি, সবসময় শ্রীশ্রীঠাকুর তথা সঙ্ঘের সেবায় নিযুক্ত থেকেছেন। সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন দেওঘর বিদ্যাপীঠে। সেখানে ভোর থেকে রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কাজ করতে হত। বলতেন, ''কত ঘণ্টা কাজ করেছি তার হিসেবনিকেশ আমরা করতাম না। ভোরে ছাত্রদের ঘুম থেকে তোলা, স্কুলে পড়ানো, পোস্ট অফিস বন্ধ হওয়ার আগেই সাইকেলে করে চিঠি পোস্ট করা ইত্যাদি সবরকম কাজই করতে হত।'' একবার কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে তাঁর চোখ কপিকলের আঘাত লেগে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। প্রবীণদের কাছে আমরা শুনেছি, দেওঘরে সেই নবাগত অবস্থায় গম্ভীর মহারাজ বাড়ি নির্মাণকাজে রাজমিস্ত্রিকে ইট বয়ে দিতেন।

পরবর্তী কালে তাঁর রচিত 'ব্রহ্মসূত্রের' বিশাল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি নিজেই টাইপ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমরা শুনি, তিনি যখন সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক, তখন কোনও কাজই

ফেলে রাখতেন না। তাঁর টেবিল সবসময় পরিষ্কার থাকত।

হিন্দুদর্শন পরিমণ্ডলে কথিত কর্মযোগকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত কর্মযোগ থেকে আলাদা বলেই মানতেন। বলতেন, ''আমাদের মঠ ও মিশনের সেবার ভিত্তি হল অদ্বৈতমত, জীবকে শিবজ্ঞান করেই সেবা করা হয়। অপরদিকে প্রচলিত কর্মযোগের ভিত্তি হল দ্বৈতমত।'' সেজন্যই স্বামীজীর সেবাধর্মকে 'সেবাযোগ' নামে প্রকাশ করতে তাঁর আগ্রহ ছিল।

পূজনীয় মহারাজ ব্যক্তির চেয়ে বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। ব্যক্তির বক্তব্য যদি যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ হত, তখনই সেই বক্তব্যটি তিনি স্বীকার করে নিতেন। বিশোকানন্দজী তখন রাঁচিতে যোগদান করেছেন, নবাগত ব্রহ্মচারী। 'শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা' গ্রন্থের একটি ঘটনা তাঁর কাছে তথ্যবিরোধী বলে মনে হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) অপর দুই গুরুভ্রাতা—কালী মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে 'এপ্রিলের গোড়াতে' বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানাদি করেছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল সেখানে কিছুদিন থাকেন, কিন্তু 'শীতবস্ত্রের অভাবে' তাঁরা তিন-চার দিন পরই ফিরে এসেছিলেন। বিশোকানন্দজীর বক্তব্য ছিল, বুদ্ধগয়ায় এপ্রিল মাসে আবহাওয়া খুব গরম হয়। গম্ভীরানন্দজী জিজ্ঞেস করলেন, ''এই ব্যাপারে are you sure?'' উত্তরে তিনি বললেন, ''হ্যাঁ মহারাজ, আমি নিশ্চিত।'' গম্ভীরানন্দজী তৎক্ষণাৎ তাঁকে দিয়ে উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ মহারাজকে একটি চিঠি লিখিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে নির্দেশ দিলেন। তথ্য-সহ বক্তব্য স্বীকার করতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

গম্ভীরানন্দজীর জীবন ছিল স্বচ্ছ, নিয়মিত। সময় ও রীতিনীতির টানাপোড়েনে গড়ে তুলেছিলেন নিজের জীবন। তাঁকে দেখে মঠের সাধুরা ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারতেন। তা সত্ত্বেও তিনি প্রয়োজনের অনুরোধে রুটিনের রদবদল করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। এবং সেই রুটিনের মধ্যে শিল্প ও রসবোধও জায়গা করে নিয়েছিল। তিনি ঘড়ির মতো যন্ত্রে পরিণত হননি। রঙ্গ-রসিকতা করে সময়ের অপব্যবহার তিনি কখনও করতেন না ঠিকই, তবে কাজকর্মের চাপের মধ্যেও ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচের ফলাফল জানতে উৎসুক থাকতেন। খবরের কাগজ পড়তে কখনও তাঁকে দেখিনি, শুনতেও চাইতেন না। প্রতিদিন রেডিওতে খবর শুনতেন। ভাল তবলা ও সরোদ শিখেছিলেন। মায়াবতীতে থাকার সময় মহারাজ ব্যাডমিন্টন খেলতেন।

একবার ব্রহ্মচারী-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্রহ্মচারীদের সামনে এক বক্তৃতায় মহারাজ বলেছিলেন, ''নিয়মিত রুটিনমতো জীবনযাপন করলে সময়ের অপব্যয় তো হয়ই না, বরং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানসাধনায় অদ্ভুত সাফল্য ও কীর্তি লাভ করতে পারা যায়।'' একথা তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ বিদ্বান সন্ন্যাসীদের জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যখন মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে অন্য কোনও শাখাকেন্দ্রে যেতেন, তখন যাওয়ার দিনের কার্যসূচি তাঁকে দুদিন আগেই সেবককে বলতে হত। যাত্রা করবার অন্তত পাঁচ মিনিট আগে তিনি প্রস্তুত হয়ে বসে থাকতেন। একবার এমন এক যাওয়ার দিনে তিনি প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির বাইরে বারান্দায় প্রায় আধঘণ্টা বসেছিলেন, কারণ পুলিশের escort আসতে দেরি করেছিল। সচিব মহারাজ তাঁকে বারবার ঘরে গিয়ে বসতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, ''আমি তৈরি হয়ে বসে আছি, তাদের যখন সময় হবে তারা আসবে।''

অদ্বৈত আশ্রমে যখন তিনি থাকতেন (বস্তুত

সারা জীবনই), তখন ঠিক সময়ে সব কাজ করতেন এবং ঠিক সময়ে খাওয়ার টেবিলে উপস্থিত হতেন। একদিন ঘণ্টা পড়তে দেরি হওয়ায় তিনি রান্নাঘরে গিয়ে ভাণ্ডারী মহারাজকে বললেন, ''May I help you, Sir?'' তাঁর বক্তব্য ছিল—দেরি হল কেন?

একবার তাঁর নিয়মের কড়াকড়িতে সেবক বিরক্তি প্রকাশ করায় তিনি মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন, ''সে কী, যা নিয়ম তা মানতে হবে বই কী? মরে গেলেও...'' —এ-পর্যন্ত বলেই তিনি থেমে গেলেন এবং একটু মুচকি হাসলেন।

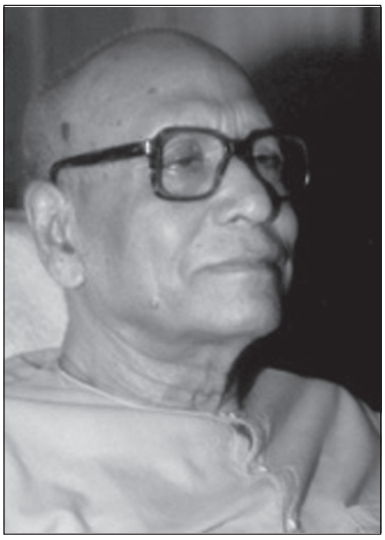

মহারাজ সময়ের মূল্য দিতে জানতেন। তিনি বিকেল পাঁচটায় বেড়াতে বেরোলে তাঁর সঙ্গে আমরা দুই সেবক থাকতাম। একদিন তাঁর ঘরে ঢুকে আমি বললাম, ''মহারাজ সময় হয়েছে, এখন বেড়াতে যেতে হবে।'' তাঁর সটান উত্তর : ''আমি ready, you are late.'' আমি বললাম, ''না মহারাজ, এখন পাঁচটা বাজছে।'' মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিল থেকে ঘড়িটি হাতে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, ''এই দেখ কটা বাজছে।'' আমি বললাম, ''এখন পাঁচটা বেজে মাত্র দু-মিনিট হয়েছে, এ কিছুই নয়।'' ক্ষণমাত্র চুপ করে থেকে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''এই যে Boeing flightগুলো চলে, এগুলো কত বেগে চলে জানিস?'' আমি বললাম, ''না, আমার জানা নেই।'' তখন মহারাজ বললেন, ''শোন, এই flight গুলো সাধারণত ঘণ্টায় ৬০০ কিলোমিটার বেগে চলে। আর এক মিনিটে যায় ১০ কিলোমিটার, দু-মিনিটে যায় ২০ কিলোমিটার। আর তুই বলছিস কিনা, দু-মিনিট সময়টা কিছুই নয়?''

মহারাজের ব্যক্তিত্বের মূলসুর ছিল ঈশ্বরানুভূতি। একথা তিনি প্রায়ই তাঁর বক্তৃতার মধ্যে তুলে ধরতেন। সেই লক্ষ্যেই তাঁর সমস্ত কাজকর্ম বিধৃত ছিল।

গম্ভীরানন্দজী তখন মঠের সাধারণ সম্পাদক। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে আয়োজিত ধর্মসভায় তিনি 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী' বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। তার দুদিন পরে বেলুড় মঠে সদ্য যোগদানকারী এক ব্রহ্মচারী গম্ভীর মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে, ''মহারাজ, ঠাকুর বলেছেন, চাপরাশ না পেলে লেকচারে কোনও কাজ হয় না, লোকে দুদিন শোনে তারপর ভুলে যায়। এই যে সাধুরা লেকচার দেন এটা তাহলে কী?''

আসলে 'কথামৃতে' ঠাকুরের ওই কথা পড়ার পর থেকে তার কৌতূহল ছিল, সাধুরা লেকচার দেওয়ার আগে কি কোনওরকমের চাপরাশ পান? আরও বিশেষ কারণ এই, তার নিশ্চিত ধারণা ছিল, যেহেতু গম্ভীর মহারাজ সর্বজনশ্রদ্ধেয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, প্রাচীন সন্ন্যাসী, বিশেষত মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য, অতএব তিনি নিশ্চয়ই কিছু চাপরাশ পেয়ে থাকবেন। কিন্তু মহারাজ সেরকম কিছুই বললেন না। প্রথমে একটু মৃদু হেসে, তারপর গম্ভীর হয়ে ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে দুবার বললেন, ''আমি লেকচার দিই না, আমি লেকচার দিই না।'' তারপর বললেন, ''সভায় বসে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি ও ঠাকুরের কথা ঠাকুরকেই শোনাই।'' একটু থেমে আবার বললেন, ''অন্য সাধুরাও তা-ই করেন।''

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গম্ভীরানন্দজী যে-ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার শিরোনাম ছিল 'ধর্ম অনুভূতির জিনিস।' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত কাজ ও কথাবার্তা—সবকিছুর পশ্চাতে ছিল আধ্যাত্মিক অনুভূতি। বক্তৃতা শেষ করেছিলেন এই বলে : ''ঠাকুর বলেছেন আদেশ বা চাপরাস না পেলে যথার্থ ধর্মপ্রচার হয় না। আপনারা বলবেন, তাহলে আপনারা কেন বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান? তার উত্তরে বলব, দেখুন আমরা বক্তৃতা দিই না। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ...' (১০।৯) ইত্যাদি। আমরা ঠাকুরের কথা ঠাকুরের ভক্তদের কাছে বলি। এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। নমস্কার।''

পূজ্যপাদ গম্ভীরানন্দজী দক্ষ প্রশাসকের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তাঁকে বলতে শুনেছি, ''এ-সঙ্ঘ ঠাকুরের, তাঁর সঙ্ঘ তিনিই চালান।'' স্বামী চেতনানন্দজীকে তিনি একবার বলেছিলেন, ''ঠাকুরই সব (problem) solve করে দেন। আমরা নিমিত্ত মাত্র।''

গম্ভীরানন্দজীর জীবনে চারটি যোগ—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও রাজযোগের সমন্বয় হয়েছিল। এগুলির কোনও পারস্পরিক বিরোধ তাঁর মধ্যে দেখিনি। সঙ্ঘের আদেশ তাঁর কাছে সর্বদা শিরোধার্য ছিল।

তাঁর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন ছিল শ্রীভগবানের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। পূজনীয় মহারাজ ছিলেন এক দিব্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

লেখকের প্রতি

* নিবোধত পত্রিকার জন্য যে-লেখাটি পাঠাতে চলেছেন তার একটি নকল নিজের কাছে রাখুন। **আমরা কোনও পাণ্ডুলিপি (মনোনীত বা অমনোনীত) ফেরত দিই না।**
* আপনার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করুন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি।
* আপনার প্রবন্ধ ১৫০০ থেকে ৩০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* ধারাবাহিক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে।
* সমালোচনার জন্য বই পাঠালে দুটি কপি পাঠাতে হবে।
* লেখা পাঠাবেন ই-মেলে (nibodhatapatrika@gmail.com), pdf করে।
* প্রবন্ধের সঙ্গে তথ্যসূত্র দিলে নিম্নোক্ত ক্রম অনুসরণ করুন :
  লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ, খণ্ড বা ভাগ (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা। তথ্যসূত্র সম্পূর্ণ না হলে রচনা প্রকাশ করা হয় না।

—সম্পাদিকা